এতিমের কেক ও টাউট ভাইয়ের গল্প

দিলরুবা শাহানা

দশটা প্রায় বাজে। নাস্তার টেবিলে সবে বসেছি। গৃহকর্মী মেয়েটি এসে বললো

‘আপনার কাছে কে একজন আইছে, বইতে কব?’

‘হ্যাঁ বল আর নাম কি জিজ্ঞেস করবে কেমন?’

তড়িৎকর্মা ইমারন ফিরে এসে বললো

‘নাম কইলোনা, কইলো বল গিয়া পাশা ভাই পাঠাইছে’

‘চা খেয়ে যাই, আর শুন একটা স্কার্ফ বা চাদর দাওতো।’

গতরাতে ঘণ্টারও বেশী সময় লাগিয়ে শাওয়ার নিয়েছি। তারপর রোদে শুকানো এই কাফতানটা পরেছি। রাত এগারোটায়ও এতে রোদের উষ্ণতা ও সুবাস লেগেছিল। সূর্যের ক্ষমতা অসাধারণ। রোদে শুকানো কিযে ভাল তা সবাই জানেও না। ধনবান দেশে ড্রয়ারে কাপড় শুকানো রেওয়াজ। ঐসব দেশে দরিদ্র এলাকাগুলো ছাড়া অন্য এলাকায় ব্যালকনীতে দড়ি টাঙ্গিয়ে কাপড় শুকাতে দিলে স্থানীয় মিউনিসিপালটি থেকে সতর্ক করে চিঠি পাঠায়। তবে ড্রয়ারে কাপড় শুকানোতে ওদের সুবিধা হল জ্বালানী শক্তি বা ইলেক্ট্রিসিটির দাম কম। চারদিকে যুদ্ধ-হাঙ্গামার ফায়দা হল নিজেদের জন্য পেট্রোল-বিদ্যুতের সস্তা সরবরাহ নিশ্চিত করেছে। সূর্যের খুব একটা ধার ওরা ধারে না। আমার এদেশে সূর্যের উপর ভরসা। শস্য-পাট বাদ দিলাম এই রোদে শুকানো কাফতানটাই কি আমেজ-মাখা। ইমারন গতরাতে ফ্যানের মৃদু হাওয়ার নিচে চিরুনি দিয়ে চুল আচড়ে আচড়ে শুকিয়ে দিয়েছে। এমন আদর আপ্যায়ন বিদেশে জুটেনা। ওর কাছে আমি রোদ আর ড্রয়ারে শুকানোর গল্প করেছি। মেশিনে কাপড় শুকানোর কথা শুনে ও হেসে কুটিকুটি। জানতে চাইলো

‘ওরা ধান-পাট কেমনে শুকায়’

আমি নিজেও জানি না কিভাবে ধান-পাট শুকায়। তাই উত্তর ছিল মূর্খের মতো

‘আমিতো ক্ষেতখামারে কাজ করি না তাই জানি না।’

ইমারন ফিরে এলো ওড়না হাতে।

‘এইটা আমার নতুন ওড়না পিন্ধি নাই, ধুইও নাই আপনি পিন্ধেন আইজ, আমি খুব খুশী হব’

বাসায় এখন কেউ নাই তাই নিজের ওড়নাটাই এনেছে। কাফতানের উপর ওড়নাটাই পরে যাব।

‘আচ্ছা নামটা কি যেন বললে পাশা না পাশা’

‘ওই রকমই একটা কিছু হইব’

‘শুন মেহমানকে নাশতা দিও’ বলে আমি ড্রইংরুমের দিকে পা বাড়ালাম। ধোপদুরস্ত প্যান্টশার্ট পরা কালোপনা রোগা মত লম্বা লোকটি উঠে দাঁড়ালো।

‘বসুন’।

আমি বসতেই সেও বসলো। তারপর বেশ প্রত্যয়ের সাথে জোরালো কণ্ঠে শুরু করলো

‘ম্যাডাম পাশা ভাই বললেন আপনার কি...

আমি নিষেধের ভঙ্গিতে হাত তুলতেই থেমে গেল।

‘শুনুন ম্যাডাম বলবেন না আপা, খালা, ফুপু বাংলা শব্দতো জানা আছে’

আমার কথায় কেমন যেন থিতিয়ে গেল লোকটা। এবার সে সাবধানে যথেষ্ট নম্র গলায় কথা শুরু করলো

‘পাভেল শামস ভাই বললেন আপনার কি প্রজেক্টে সাহায্য দরকার, কি করতে হবে যদি বলেন?’

একটু ছিন্তিত। কিসের প্রজেক্টে? কার প্রজেক্টে? মাথামুণ্ডু বুঝলাম না। তাই বিস্মিত প্রশ্ন

‘আমার কি প্রজেক্টের কথা?’

‘এতিমদের জন্য কি যেন করার কথা’

‘ও হ্যা এতিমদের... আচ্ছা আপনার কাজটা কি?’

‘আমার একটা ছোটখাটো কোম্পানি আছে; বিদেশ থেকে যারা আসেন বা বিদেশে যারা থাকেন তাদের নানা সার্ভিস দিয়ে থাকি’

‘কি রকম?’

‘এই যেমন আপনার এপার্টমেন্টে ভাল ভাড়াটিয়া বসানো, বদ ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ, ইনস্যুরেন্সের পলিসির টাকা আদায়...’

‘ওহ & শুধু দাঙ্গাবাজি আর হুজ্জতি কাজ করে বেড়ান’

‘না অন্যকাজও করি। যেমন ছবি মানে জয়নুল-কামরুলের চিত্রকর্মের নকল কিনে দেওয়া, যারা বিদেশে থাকে তারা ছবিটবি টাঙ্গিয়ে দেশকে মনে রাখতে চায় বা বিদেশীদের দেখাতে চায়, হবে কোন একটা। বই ছাপাতে চান যদি আমাদের হাতে প্রকাশক-লেখক দুইদলই আছে সাহায্য করার জন্য’

‘প্রকাশক দরকার বুঝলাম লেখক কেন?’

‘মুখবন্ধ লেখার জন্য প্যানেল অফ রাইটার ঠিক করা আছে, অস্ট্রেলিয়ার জন্য একদল, আমেরিকা, বিলাত, জাপান, সুইডেন অন্যদল। যেখান থেকেই আসেন বই বার করতে আমাদের লেখকরা তৈরি মুখবন্ধ লিখে দেওয়ার জন্য, তবে এসব প্রজেক্টের খরচপাতিও করতে হয়, আপনার প্রজেক্টের ব্যাপারটা যদি বলেন’

‘আমার বড় কোন ব্যাপার নয়, আমার খুব প্রিয় একজনের জন্মদিনে এতিমদের কেক খাওয়াতে চাই’

আমার নম্র বয়ান শুনে লোকটির বিস্মিত উক্তি

‘বিদেশে থাকলে মানুষের আত্মা কত বড় হয় দেখেন এতিমদেরও কেক খাওয়াতে চায়!

লোকটির জ্ঞান সীমিত। তার ধারনা বিদেশবাসী বড়লোকরা বড়আত্মার হয়। অথচ যে এতিমখানাতে কেক দেব ভাবছি সেটি তৈরি করেন এই দেশেরই এক ধনী লোক। সেই কবে সেই ১৯৩৭সালে। ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তিটিই ১৯৩৫সালে ইতালি ও আয়ারল্যান্ডে দুর্গতদের জন এদেশ থেকে অর্থসাহায্য পাঠিয়েছিলেন। এইসব তথ্য জানা থাকলে এই লোকটা বিদেশবাসীর বদান্যতায় এতো বিগলিত হতো না বোধহয়। মানুষ আমিরখানার বিষয়ে জানতে যেমন কৌতূহলী এতিমখানা বিষয়েও তেমনি আগ্রহী কেন হয়না। এই এতিমখানাতে মাংসভাত পাঠানো হয়। মানুষের দানে অনেক উপকার হয় এতিমদের। একবার এতিমখানা পরিচালনাকারী কর্মীরা বললো

'মাংস প্রায়ই আসে আপনারা যদি এতিমদের জন্য একবেলা মাছ-ভাতের ব্যবস্থা করতেন ভাল হত'

ঐবার ওখানে ছিল তিনশ' পনেরো জন বাচ্চা। বাচ্চাদের সংখ্যা সবসময় এক থাকেনা। তবে মাছ দেওয়া বেশ ঝক্কির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাওয়াঘাট থেকে তাজা পাঙ্গাশ নাকি রুইমাছ কিনে নিউমার্কেটে গিয়ে মাছ ওয়ালাকে দিয়ে ঠিক এক মাপে তিনশ' ত্রিশ টুকরা করিয়ে কাটানো। তারপর চাল-ডাল, তেল-সব্জীসহ এতিমখানায় পৌঁছানো। বাড়ীর ড্রাইভাররা খুব ব্যাজার হয়েছিল এই মাছের আবদারের ঝামেলা সামলাতে গিয়ে। মাংশভাত হলে একবারে এক বাজার থেকে সব কিনে পৌঁছে দেয়, উপকরণ পরিমাণে কিছুটা বেশী দিয়ে আসে। রান্না হলে তরকারী, শব্জী, ডাল তিনটা আইসক্রিমের বক্সে করে নিয়ে আসে তখন মাথা প্রতি হিসাবমত জিলাপি দিয়ে আসে। ঐদিন বাড়ীর সবাই এতিমদের মত ঐ একই খাবার খায়। কেক দেওয়াটা ঝামেলা। এবার তাই একজনকে দায়িত্ব দিতে চাই যে ভাল মানের সুস্বাদু কেক এতিমদের জন্য ব্যবস্থা করবে। যে কেউ এতিমদের জন্য কেক চাই শুনলেই হয়তো নিম্নমানের যাচেছতাই কিছু গছিয়ে দিবে। এতিমরা নালিশই বা জানাবে কাকে? আমি আমার ইচ্ছাটা লোকটিকে গুছিয়ে বললাম।

'অসুবিধা নাই দামী হোটেল থেকে টপ কোয়ালিটির কেক অর্ডার দিব মিনিস্টারের বাড়ীর নামে, বাজে কেক দিলে কল্লা ঘাড়ে থাকবে না জানবে। ম্যা.. এ সরি আপা আপনি কতজন এতিম আছে আর কোন তারিখে কেকটা যাবে যদি বলে দেন তাইলেই হবে আর '

ওকে কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে বললাম

'এখানে মিনিস্টারের কথা কেন আসছে!'

' মিনিস্টারের নাম ব্যবহার! এইটা ভাল জিনিস ম্যানেজ করার একটা উপায় আর এতে কারও কোন ক্ষতি হবেনা। আচ্ছা আপা সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার জোগাড় করবো?'

'কেন?'

'আপনি যখন এতিমদের কেক দিবেন ছবি তুলবে, পত্রিকায় নিউজ করবে।'

আমি কঠিন গলায় বললাম

'না'

লোকটি আবার থতমত খেয়ে চিপসে গেল। তাকে আগামী দিন আসার কথা বলে বিদায় করলাম। ও চলে যাওয়ার পর পাশাকে ফোন করলাম

'হ্যালো পাশা কাকে পাঠিয়েছ ভাই, এতো দেখি মহা চালিয়াত!'

'আপা ভাল ম্যানেজ করে, এভাবেই ওর পেট চলে। তবে কতটা সৎ ভাবে করে সেটা দেখার বিষয়। এ মন্ত্রী থেকে মস্তান, পীর-সাহেব থেকে চোর-সাহেব সবার সঙ্গেই যোগাযোগ রাখে; আললাহ্ থেকে ইবলিশ সব

বিষয়ে কিছু না কিছু জানে। তবে কারও ক্ষতি করার কন্ট্রাক্ট সে নেয় না। তোমার কাজটা সে সততার সাথেই করবে, পারিশ্রমিক তুমি ভালই দেবে জানি। ওর উপর ভরসা করতে পার, আমাকে কখনও ঠকায়নি।'

পাশার কথায় আস্থা বাড়ে, নিশ্চিত হই এতিমরা এই টাউট লোকটির কল্যাণে ভাল কেকই পাবে।